গল্প

দ্বিখণ্ডিত

সুব্রত হালদার

আমন্ত্রণটা হঠাৎই এসে উপস্থিত হল। আর যাত্রার তারিখটা হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ের ওপর। আমন্ত্রণকারী হয়তো ইচ্ছাকৃত ভাবেই এটা করেছে যাতে ভাবনাচিন্তার অবসর না থাকে। সে ক্ষেত্রে ঋণাত্মক সিদ্ধান্তর সম্ভাবনা কম হয়।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর রিনা একটু গড়িয়ে নেবার তোড়জোড়ে ব্যস্ত ছিল। গড়িয়ে নেওয়া মানে অবশ্য ঘুম নয়। দিবানিদ্রার অভ্যাস রিনার কোন দিনই নেই। গড়িয়ে নেবার অর্থ আক্ষরিক অর্থেই গড়িয়ে নেওয়া। অর্থাৎ একটা দুটো ম্যাগাজিন নিয়ে একটু এপাশ ওপাশ করা। তারপর চারটে নাগাদ উঠে পড়া। এই তোড়জোড়ের মাঝেই জানালা গলে চোখে পড়ল একজন সাইকেল আরোহী বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর সাইকেল স্ট্যান্ড করে পলকা ক্যাঁচোর ম্যাঁচোর শব্দে গেটের অর্গল খুলে লোকটি সিঁড়ির সামনে এসে হাঁক দিলেন, ক্যুরিয়ার আছে। রিনার হাতে খামটা ধরিয়ে দিয়ে একটা কাগজে সই করিয়ে ভদ্রলোক প্রস্থান করলেন। রিনা একটু অবাক হল ক্যুরিয়ার দেখে। আজকাল অবশ্য দুই একটা ক্যুরিয়ার আসে মিউচুয়্যাল ফান্ড, ব্যাঙ্ক থেকে কিন্তু সেগুলির চেহারা অন্যরকম। ল্যাকপ্যাক খামে একপৃষ্ঠার একটা চিঠি বা কোন স্টেটমেন্ট। কিন্তু আজকের খামটা রিনাকে অবাক করল। চকচকে সাদা রঙের বেশ ভারী খাম। তাড়াতাড়ি খুলে রিনার চোখ কপালে। মধ্যে দু-দুটো প্লেনের টিকিট ও তার সঙ্গে পিন করা একটা চিঠি। রিনা ভাবল লোকটা নিশ্চই ভুল করেছে। কার না কার খাম তাকে দিয়ে চলে গিয়েছে। তা হলেও তো আর কিছু করার নেই। লোকটা নির্ঘাৎ এতক্ষণে অনেক দূর চলে গিয়েছে। রিনা খাম উল্টে দেখল। তার নামই লেখা আছে।

ঠিকানাটাও নির্ভুল। রিনা এবার মধ্যের চিঠিটা খুলে ফেলল। হাতের লেখাটা পড়তেই অদ্ভুত এক শিহরণ খেলে গেল। এ তাঁর অনেকদিনের পরিচিত হাতের লেখা।

প্রিয় রিনি। দুটো ফ্লাইট টিকিট পাঠালাম। কর্তাকে দিন দশেকের জন্য কর্মনাশা করে নিয়ে চলে আয়। ভাল লাগবে। বাকি কথা এলে হবে ইতি— প্রাঞ্জল।

পুনশ্চ: ভাবিস না পকেটের পয়সা খরচ করে ফ্লাইট টিকিট কাটলাম। ওটা রিওয়ার্ড পয়েন্টে পাওয়া, না নিলে নষ্ট হয়ে যেত। এখনও একই রকম আছি, কৃপণশ্রেষ্ঠ।

রিনার মনে পড়ে গেল কৃপণশ্রেষ্ঠ উপাধিটা তারই দেওয়া।

প্রিয় রিনি। প্রিয়, যাক সুপারলেটিভ ডিগ্রির সম্বোধনটা তবে বন্ধ হয়েছে। তবে রিনি নামটা রিনা প্রায় ভুলতেই বসেছিল। কতদিন পরে? রিনা মনে মনে হিসাব করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলল। রিনার মনে জেগে উঠলো রিনা থেকে রিনি হবার দিনটার কথা। তখন যাদবপুর ইউনিভার্সিটির বি এস সি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। একদল ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে ওঁরা কয়েকজন ছিল একটু আলাদা। বিজ্ঞান নিয়ে পড়লেও ওদের ব্যাগ খুঁজলে পাওয়া যেত কবিতার বই। রবীন্দ্রসদন এলাকায় সবথেকে সস্তা টিকিটের লাইনে ওদের মুখ। ওই কয়েক জন মিলেই বের করত দেওয়াল পত্রিকা— প্রতীত। কদাচ বিশেষ সংখ্যা, ছাপানো আকারে। পত্রিকার প্রধান কারিগর ছিল সেকেন্ড ইয়ারের প্রাঞ্জল। লেখা জোগাড় করা থেকে ছাপানো সবকিছুতেই ওর উৎসাহ ছিল সবথেকে বেশি। লিখতও চমৎকার। একটা নীল ডায়েরি থাকতো সবসময়, ঝোলা ব্যাগটায়। সেটা ভরা ছিল তার কবিতা, গল্প ও নানান লেখায়। প্রাঞ্জলের সঙ্গে ছিল রিনা ও জনা দশেক। যদিও সম্পাদিকা হিসাবে নাম ছিল রিনার। এই নিয়ে রিনা প্রাঞ্জলের কাছে প্রতিবাদও করে, শুধুশুধু আমার নামটা কেন রেখেছ, সবই তো নিজে কর, নামটা নিজের রাখ না।

— আমার? আমি কী করি, সবই তো তুই করছিস।

— আমি? আমি কী করি?

— স...ব। তুই না থাকলে পত্রিকাটা বের হত?

— কী সব আজে বাজে বলছ!

— আজে বাজে না রে, একদিন সব বুঝিয়ে বলব।

এই সময়ের একটা বিশেষ সংখ্যার জন্য ওঁরা তৈরি হচ্ছিল। একজন খ্যাতনামা লেখক লেখা দেবে বলে কথা দিয়েছিলেন। ওটা যদি পাওয়া যায় তবে হাতে চাঁদ পাওয়া থেকে বেশি কিছু হবে। ওঁরা দিনের পর দিন সেই লেখকের কথা অনুযায়ী এখানে ওখানে ছুটছিল। রোজই, আজ না কাল। শেষে একদিন ওদেরকে বললেন আকাশবাণীতে দুপুর দুটোয় দেখা করতে। সেইমত প্রাঞ্জল ও রিনা ক্লাস কেটে দৌড়েছিল আকাশবাণীতে। দুপুর একটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও তার দেখা মেলেনি। শেষে ভাঙা মন নিয়ে ওঁরা দুজনে নেমে এসেছিল পথে। কারও মুখে কোন কথা নেই। কারও অজানা নির্দেশেই হাঁটা শুরু করেছিল ময়দানের বুক চিরে। যদি ফেরার পথে দুইটাকা বাস ভাড়া বাঁচানো যায় সেটাই কী ছিল উদ্দেশ্য? ময়দানের মাঝামাঝি এসে ওদের ক্লান্ত পা আরও শ্লথ হয়ে এসেছিল। রিনাই বলেছিল, একটু বসলে হয় না? দুইজনে বসেছিল। দুজনেই কতক্ষণ নিশ্চুপ বসেছিল মনে নেই। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে প্রাঞ্জল বলেছিল— তোকে রিনি বললে কী কিছু মনে করবি?

রিনা উত্তর দিয়েছিল সে কী, তা কেন? তবে রিনা নামটা কি তোমার ভাব লাগে না?

— একদমই না। কোন ছন্দ নেই। রিনা, রিনা, বিকৃত গলায় কয়েকবার উচ্চারণ করে প্রাঞ্জল বোঝানোর চেষ্টা করে যে রিনা নামটা কতটা ছন্দহীন। প্রাঞ্জলের কাণ্ড দেখে রিনা হেসেছিল। উত্তরে বলেছিল রিনি টা কি খুব ভাল? তুমি আমাকে ঋণী করে দিচ্ছ।

— ঋণী তো বটেই, তবে তুই কেন। তোর কাছে ঋণী।

— কী সব যা-তা বলছ।

প্রাঞ্জল আনমনে ঘাসগুলোকে এলোমেলো করতে করতে বলল, তুমি তো তুমি ওগো সেই তব ঋণ...

প্রাঞ্জলের খাপছাড়া কথার অর্থ বুঝতে পারে না, প্রশ্ন করে, তার মানে? আমার নারে, কবিগুরুর কথা।

প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেনি ওঁর কথার অর্থ কিন্তু রিনার ভুল হয়নি ওর চোখের ভাষা পড়তে।

ওঁরা আরও অনেকক্ষণ নিশ্চুপ বসে ছিল। একে অপরের কাছে আশা করছিল বিশেষ কিছু কথার। একদল পাখি বাসায় ফেরার আগে ওদের ওপরে চক্রাকারে ঘুরে কলতান করছিল। বোঝার চেষ্টা করছিল অচেনা আগন্তুকদের, না কি ওদের সুক্ষ্ম বোধ দিয়ে ধরে ফেলেছিল স্তব্ধতার রহস্য। পাখির কলতানও রিনার কাছে বিরক্তিকর লাগছিল। ওতো অপেক্ষা করে ছিল অন্য কোন শব্দের যা প্রাঞ্জলের মুখনিঃসৃত। প্রাঞ্জলও নিশ্চয়ই একই রকম ভাবছিল। কিন্তু কথা আর এগোয়নি। প্রাঞ্জলের অনেক কথা বুঝিয়ে বলার বাকি ছিল, বাকিই থেকে গেল। সন্ধ্যা নামার আগেই দুজনকে দুজনের কাছে বিদায় নিতে হয়েছিল বাড়ি ফেরার তাড়ায়।

রিনা বালিশ টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল। দৃষ্টি গিয়ে পড়ল শো-কেস এর ওপর রাখা অরূপের ছবিটায়। ওঁদের বিয়ের ছবি। অরূপ এখন নিশ্চই টিফিন করে আবার ফিরে এসেছে জালঘেরা খুপচিতে। এখন ব্যাঙ্কিং আওয়ার চারটে পর্যন্ত হওয়াতে খাটনি একটু বেড়েছে। ও কি বাড়ি ফিরে চিঠিটা পড়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠবে না সন্দেহের চোখে তাকাবে? সন্দেহ করার তো কোন কারণও নেই কারণ ওঁদের সম্পর্ক বিষয়ে অরূপের তো কিছু জানার কথা না সম্পর্ক বিষয়ে? রিনা মনে মনে হাসল। এমন কোন সম্পর্ক তৈরি হল কবে যা কোন স্বামীর কাছে রাগের কারণ হতে পারে? রিনা নিজেকেই প্রশ্ন করল, এমন কোন সম্পর্ক হল না কেন? কোন বাধা তো ছিল না। তবে কে দায়ী! রিনার মনে পড়ে গেল সেই দিনটার কথা। সকাল থেকেই খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ক্লাস শেষে রিনা রোজকার মত এইট বি বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগোয়। রাস্তার ওপার থেকেই চোখে পড়ে প্রাঞ্জলকে। বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে। রিনা বুঝতে পারে প্রাঞ্জল ওখানে যতটা না বাস ধরার প্রয়োজনে তার থেকে বেশি অন্যকিছু। কিছুদিন হল প্রাঞ্জলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সেই কারণে খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ নেই। তার নিজের চোখও কি প্রাঞ্জলকে খুঁজে বেড়ায় না, ক্যান্টিন, বাসস্ট্যান্ড, কলেজের রাস্তার এদিকে। রিনা ছাতাটা বন্ধ করতে করতে পাল্টা প্রশ্ন করল, তুমি?

— ভাল না।

— সে কি! কী হল?

— কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

প্রাঞ্জলের কথাটা রিনার গালে ঠাস করে একটা চড় বসাল। নিজেকে সামলে নিয়ে রিনা জিজ্ঞাসা করল, কোথায়?

— পুনেতে, এম বি এ করতে।

— ফিজিক্সে মাস্টার্স ছেড়ে হঠাৎ এম বি এ কেন?

প্রাঞ্জল কোন উত্তর দেয়নি। দেবার কথাও না। পরক্ষণেই রিনার মনে হয়েছে পৃথিবীর নির্বোধতম প্রশ্নটাই সে করেছে। সেই মুহূর্তে তারতো অবাধ্য চোখের জলে বুক ভাসানোর কথা। সে চোখের সামনে ঝাপসা দেখছিল কিন্তু সেটাও আড়াল করেছে। বৃষ্টির জল বলে রুমাল বার করে সে মুছে দিয়েছে যা কিছু সম্ভাবনা। প্রাঞ্জল ফোন নম্বর চেয়েছিল। সেটাও রিনা দিতে পারেনি। কারণ তখন না ছিল বাড়িতে ফোন না ছিল চেনা পরিচিতির বৃত্তে। যে কথা সামনা সামনি প্রাঞ্জল বলতে পারেনি সেটা হয়তো বলতো দূর থেকে দূর-আলাপে।

বি এস সি পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই রিনার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। ছেলে শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত, ব্যাঙ্কে চাকরি করে। রিনা বারকয়েক ছুটে যায় এস টি ডি বুথে। ফোন নাম্বার জোগাড় করে যোগাযোগের চেষ্টা করে প্রাঞ্জলের সঙ্গে। কিন্তু বারবারই ও প্রান্ত থেকে উত্তর আসে ছাত্রদের হস্টেলে ফোন ট্রান্সফার করা সম্ভব নয়। কোন ম্যাসেজ থাকলে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রিনা কী ম্যাসেজ দেবে? ওঁর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে এই? কিন্তু এমন তো কিছু ঘটেনি যাতে প্রাঞ্জলকে সংবাদ জানানোটা জরুরি। মনের হিসাবের কী মূল্য আছে এই পৃথিবীতে। মনের হিসাব বাদ দিলে ওরা তো স্রেফ দুই বন্ধু। রিনা এখনই বিয়ে করবে না মনস্থির করে। কিন্তু সেটাও দীর্ঘদিন বহাল রাখতে পারে না, পরিবারের চাপে। গুরুজনদের আদেশ সম অনুরোধের উত্তাপে রিনার প্রতিজ্ঞার বরফ গলে বাষ্পায়িত হয়ে যায়। তারপর, গঙ্গাজল, নারায়ণ, অগ্নি ও এক দঙ্গল আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের উপস্থিতিতে শুভকাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। শুধু প্রাঞ্জল দূরে থাকে।

প্রাঞ্জল বৎসারান্তে ছুটিতে এসে রিনার বাড়ি এসেছিল। রিনার মায়ের কাছে রিনার বিয়ের খবর পায়। তারপর থেকে আর কোন যোগাযোগ নেই। হঠাৎ বেশ কিছুদিন পরে পরে দুপুরের ডাকে একটা চিঠি রিনার কাছে পৌছায়। প্রিয়তমাসু সম্বোধনে প্রাঞ্জল জানিয়েছে ওঁর চাকরি পাওয়ার কথা। বিদেশি ট্যুরিজম সংস্থায়। থাইল্যান্ডে পোস্টিং। আবার তার কিছুদিন পরে আরেকটা চিঠি। প্রিয়তমাসু রিনাকে সপরিবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে। এবার রিনা চিঠির উত্তর দেয়। প্রথমেই প্রতিবাদ করে প্রিয়তমাসু সম্বোধনের। তারপর তার ওখানে যাওয়ার অপারগতা জানিয়ে। শেষে প্রাঞ্জলের কর্ম জীবনের উন্নতি কামনা করে। উত্তর আসে, প্রিয়তমাসুর মধ্যে আপত্তির কি আছে। একজন মানুষ কি তাঁর স্বামী ছাড়া অন্য কারও-কারওর প্রিয়তমা হতে পারে না। সে কী তাঁর বাবা মা ভাই বোন বা বিশেষ কোন বন্ধু বান্ধবীর প্রিয়তম নয়। সেই শেষ চিঠি। রিনার উত্তর দিতে মন চায় না। কী লিখবে সে এর উত্তরে?

অরূপ অফিস থেকে ফিরতেই রিনা সদ্য ক্যুরিয়ারে আসা খামটা অরূপের হাতে ধরিয়ে চলে গেল নিয়মমাফিক চা করতে। অরূপকে কিছুটা সুযোগও দিল চিন্তা করার ও সিদ্ধান্ত নেবার। চা নিয়ে ফিরতেই অরূপের উজ্জ্বল মুখ দেখেই সিদ্ধান্তটা রিনা বুঝে ফেলল। অবশ্য এটাই ও আশা করেছিল। অরূপের যেমন উদার সাদা মন তাতে এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক। শোফায় আধশোয়া অরূপের সামনে টেবিলে চা রেখে বক্ষলগ্ন হয়ে রীনা জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী সিদ্ধান্ত মশাই।

— ফ্যান্টাস্টিক, আই অ্যাম এক্সাইটেড!

— কিন্তু স্ত্রীর এক অচেনা বন্ধুর এমন আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়াটা কি ঠিক হবে?

অরূপ একটু চিন্তিত ভাব করে রিনাকে কোলে টেনে নিল, কেন? কোন লটঘট ছিল না কি? আই মিন চুমা টুমা।

রিনা অরূপের গালে ছোট্ট একটা চড় লাগিয়ে বলল, হনুমান কোথাকার, শিম্পাঞ্জি।

হিসাবমত ওরা দুজনে ব্যাঙ্কক গিয়ে পৌছাল। সপ্রতিভ অরূপকে দেখে মনে হয় না যে এটা ওদের প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। লাগেজ ক্লিয়ারিং এর পরে বাইরে আসতেই চোখে পড়ল বোর্ডটা 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সিনহা। গেস্ট অফ মিঃ পি বিশ্বাস।' প্রাঞ্জল নিশ্চয় নিজে হাতে লিখে পাঠিয়েছে, বাংলায়, ওদের সারপ্রাইজ দেবার জন্য। রিনা মনে মনে ভাবল প্রাঞ্জল তা হলে একই রকম আছে, তবে খেয়াল করল ভাষাটা কিন্তু ইংরাজী।

থাকার জায়গাটাও মনোরম। ব্যাঙ্কক শহরের প্রায় ষাট-সত্তর কিলোমিটার উত্তরে। সদ্য গড়ে ওঠা একটা ফরেস্ট রিসর্টের বাংলো। কাজ এখনও চলছে, শেষ হলে ওটাই হবে পাঁচ-তারা বা সাত-তারা একটা কান্ট্রি রিসর্ট। প্রাঞ্জলদের কোম্পানিই তৈরি করেছে। আরও খবর নিতে জানল সাহাব সাইটে আছেন রাত ৭টা ৮টা নাগাদ ফিরবে।

ড্রইং রুমেই দেখা হল প্রাঞ্জলের সঙ্গে। রিনা খুঁটিয়ে দেখল। কিছুটা একই রকম, কিছুটা অন্য রকম। একটু ওজন বেড়েছে হয়ত। আগে ধীর স্থির ছিল এখন একটু ছটফটে লাগছে। কিন্তু একই চোখ। একই কথা। অরূপ ও প্রাঞ্জলের অল্প সময়েই এত বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে সেটা রিনার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। ওদের বকবকানির মাঝে রিনার উপস্থিতি আপাত গৌণ।

তবুও প্রাঞ্জলের কয়েক ঝলক দৃষ্টি রিনার চোখ এড়াল না। সেই দৃষ্টি যা সময়ের বশে থাকে না। সুযোগ বুঝে রিনা প্রশ্ন করল, যা জানার জন্য সে কয়েক বছর যাবৎ ব্যাকুল— তুমি কি এখনও কবিতা লেখ?

প্রাঞ্জল এক টুকরো হাসি দিয়ে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল।

অরূপ নতুন বিষয় পেয়ে বলল, তাই নাকি, আপনি কবিতা লিখতেন।

— লিখতো মানে। শোরগোল তুলে দিয়েছিল।

অরূপ উৎসাহিত হয়ে উঠল। কী রকম! কী রকম!

প্রাঞ্জলের লাজুক দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে রিনা বলল। মনে আছে সেই লালবাজারের কেসটা।

প্রাঞ্জল মৃদু হাসল।

অরূপ দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে বলল, লালবাজার, উরিব্বাস! কবিতা লিখে লালবাজারে তো ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হবার মত ঘটনা। রিনা বলতো ঘটনাটা ঠিক কী?

— তখন আমি সেকেন্ড ইয়ারে। মানে প্রাঞ্জল থার্ডে। সেন্ট্রাল এভিনিউ কলুটলার মোড়ে একটা বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছ কে বা কারা কেটে ফেলে। এই নিয়ে হুলস্থূল। সেই সময় প্রাঞ্জল একটা কবিতা লেখে। কবিতাটা আমিই বহুল প্রচারিত একটা বাংলা দৈনিকে পাঠিয়ে দিই। সেটা শনিবার প্রকাশ হতেই লালবাজার থেকে কয়েকজন পুলিশ এসে প্রাঞ্জলকে নিয়ে সোজা চলে যায় লালবাজারে। অবশ্য জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়েও দেয়। এমনিতেই এইবাদি ওইবাদিদের শহুরে সোর্স পুলিশ তখন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুলিশের ধারণা হয়...।

— গ্র্যান্ড, ব্র্যাভো। অরূপ উৎসাহে খাড়া হয়ে বসল। প্রাঞ্জলের দিকে ফিরে বলল, কবিতাটা দেখাতে পারেন?

— না হে, ওসব কিছু নেই। প্রাঞ্জল হতাশা আড়াল করার চেষ্টা করল।

— সে কি এত কবিতা লিখলেন একটাও রাখেননি।

— না। একটাও না। নিজেকে ভালবাসতে শিখলাম কবে যে নিজের জিনিস গুছিয়ে রাখব।

রিনা খেয়াল করল মস্তিষ্কে ঠাণ্ডা তরলের শাসনে প্রাঞ্জলের শেষের কথাগুলো জড়িয়ে গেল।

অরূপ রিনাকে উদ্দেশ করে বলল, রিনা তোমার মনে আছে কবিতাটা?

প্রাঞ্জলের মৃদু প্রতিবাদ, ওসব ছাড়ুন তো, ইমম্যাচুওর বয়সের লেখা। ওটা একটা কবিতা হল। বোগাস!

রিনা বলল, ইমম্যাচুওর বয়স বলেই অমন আগুন ছুঁড়তে পেরেছিলে, বোদ্ধা হলে পারতে? মনে মনে বলল, প্রাঞ্জল তুমি জান না। কৃষ্ণচূড়া আমার জীবনটা কেমন ওলট-পালট করে দিয়েছিল।

— সে যাই হোক শুনিনা কী লিখেছিলেন। রিনা তুমি বলতো। অরূপ রিনাকে অনুরোধ করল।

— পুরোটা মনে নেই, তবে শুরুটা এই রমক... "আমি সেই লোকটাকে খুঁজছি,/যদি পাই তবে গুলি করে মারবো।"

রিনা থেমে গেল। অরূপ বলল, কী হল, তারপর।

— অনেক বড়, এখন বলা যাবে না। শেষটা শোন, — "ভাষাহীন প্রাণ এর বলিদান,/তোরা মুখবুজে সয়ে যা, সভ্য!/ তাই, আমি সেই

লোকটাকে খুঁজছি!"
কুক এসে বলল ডিনার রেডি। এক ঢোকে গ্লাস শেষ করে প্রাঞ্জল ও অরূপ এগোয় ডিনারের দিকে। সঙ্গে রিনা।

ব্যাঙ্কক ও তার আশেপাশের বেশ কয়েকটা জায়গা চুটিয়ে ঘুরল রিনা ও অরূপ। ফিরে যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে। আজ মধ্যরাতেই থাই এয়ারে ফেরার কথা। অরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রোকোডাইল প্রজেক্ট দেখতে যাবার। ওর ফটোগ্রাফির শখ, সেইহেতু ক্যামেরা আর বেশ কিছু ফিল্ম নিয়ে সকাল সকাল রওনা হয়ে গিয়েছে। রিনা একটু বেলাতেই ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট রুমে। ব্রেকফাস্ট করছে এমন সময় প্রাঞ্জলের প্রবেশ, আরে রিনা, তুই অরূপের সঙ্গে যাসনি!
— ক্রোকোডাইল প্রজেক্ট দেখতে?
— হ্যাঁ!
— দেখো প্রাঞ্জল। আমি এটা কল্পনা করতে প্রস্তুত আছি যে আমি একটা নদীতে সাঁতার কাটছি আর একটা ইয়া বড় কুমির এসে আমার পা কামড়ে ধরে গভীর জলে নিয়ে গেল।
— হাও ক্রুয়েল।
— কিন্তু এটা ভাবতে আমি রাজি না যে কয়েকটা অসহায় অসীম ক্ষমতাধর জন্তুকে আমরা মাথার জোরে জোর করে বন্ধ করে রেখেছি, অত্যাচার করছি..., দ্যাট ইজ মাচ মোর ক্রুয়েলিটি টু মি।
— ঠিক আছে বাবা। তোর সঙ্গে তর্কে কোন দিনই জিতিনি। আজও নয় হার মানলাম। তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট করে নে। তোকে তাহলে আমাদের এখানকার প্রজেক্টটা ঘুরে দেখাই। মনে রাখ এই শেষ সুযোগ। এরপরে তোর আমাদের মত লোকেদের এখানে প্রবেশ নিষেধ। ওনলি মাল্টি-বিলিয়নাররাই এখানে আসতে পারবে। মিলিয়নাররাও নস্যি। পার নাইটে কম করে ফোর থাউজেন্ড ডলার মানে প্রায় দুই লাখ টাকা।
রিনা বুঝল, মাস্টার ইন বিজনেস এডমিন মিস্টার প্রাঞ্জল বাসু, মিলিয়ন, বিলিয়ন-এর রূপালি হিসাবটা বেশ ভালই রপ্ত করেছে।
ব্রেকফাস্ট শেষে রিনা ও প্রাঞ্জল হেঁটে রওনা দিল প্রজেক্ট সাইট-এর দিকে, প্রাঞ্জলই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করল। কিরে হঠাৎ করে বিয়ে করে নিলি?
— কী আর করব?
— লাভ না এরেনজড?
রিনা হাসল, তুমি বল এখনও বিয়ে করনি কেন?
— করব।
— কবে?
— জানি না।
— মেয়ে দেখব, আমার অনেক বান্ধবী আছে। সব দিক থেকে তোমার মানানসই হবে।
প্রাঞ্জল কোন উত্তর দিল না, এতক্ষণে ওঁরা এসে পৌঁচেছে কোর-এরিয়াতে। এখানেই তৈরি হচ্ছে মাল্টি বিলিয়নারদের জন্য বিশেষ রাত্রিযাপনের ঘর। রিনা দেখল চারপাশে ঘন জঙ্গল। কয়েকশো বছরের পুরনো বিশাল বিশাল গাছ। মাঝখানে প্রায় এক একর এলাকায় গাছগুলিকে আট দশ ফুট উচ্চতায় কেটে ফেলা হয়েছে। তার ওপর নানান আকৃতিতে তৈরি হচ্ছে এক একটা ছোট কিন্তু বিলাসবহুল কটেজ। মাল্টি বিলিয়নারদের কর্মব্যস্ততার মাঝে এক আধদিন স্ট্রেস-ফ্রি হবার বন্দোবস্ত।
প্রাঞ্জল বেশ গর্ব ভরেই বলল, জানিস এই এক একটা কটেজের একদিনের ভাড়া কত?
রিনা আগেই শুনেছে। নির্লিপ্ত গলায় বলল, ফোর থাউজেণ্ড ডলার।
— অর্থাৎ কলকাতা শহরের বেস্ট ফাইভ স্টার হোটেলের প্রায় বিশ-ত্রিশটা রুমের ভাড়ার সমান এক একটা কটেজ।
রিনা অবাক চোখে তাকাল।
— কারা এখানে আসবে জানিস। ইউরোপ-আমেরিকার টপ ক্লাস বিজনেসম্যানরা। অলরেডি ট্রাভেল এজেন্টরা ফাস্ট সিক্সথ মানথ-এর এডভান্স বুকিং করে ফেলেছে। আর একটা ব্যাপার জানলে তুই নিশ্চই আরও অবাক হবি।
— সেটা কী শুনি?
— ইউ আর নট বিলিভ, এটা আমার নিজস্ব প্রজেক্ট। সম্পূর্ণ আমার ব্রেনচাইল্ড। আই অ্যাম অলরেজি হাইলি রিওয়ার্ডেড ফর দিস প্রজেক্ট। স্পেশালি এই কটেজ অন ট্রি কনসেপ্টটা...
রিনার চোখমুখ দেখে প্রাঞ্জলের একটু সন্দেহ হল। রিনা যতটা কনভিসড সবে বলে আখা করেছিল ততটা কনভিসড বলে মনে হচ্ছে না।
রিনার মনে হল যাকে সে দেখতে এসেছিল এ সে প্রাঞ্জল না। তার কাছে প্রাঞ্জল ছিল স্কেচ করা ছবির মত। প্রতিটি রেখাই ছিল নিরাভরণ, অনেক কথায় ভরা। কিন্তু আজকের প্রাঞ্জল যেন রঙকরা নিটোল ছবি। জৌলুশ আছে কিন্তু আসল প্রাঞ্জলকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাও আর একটু তলিয়ে দেখার জন্য প্রশ্ন করল, প্রাঞ্জল তুমি কী জান যে, যে গাছগুলো কটেজ বানাবে বলে তোমরা কোমর থেকে কেটে ফেলেছো সেগুলোর বয়স কত?
প্রাঞ্জল কাঁধ ঝাঁকাল। তার অর্থ জানি না জানার প্রয়োজনই বা কী।
— ওই গাছগুলো কবে প্রথম বীজ ফুঁড়ে দুটো কচি পাতা মেলেছিল তা কী জান?
প্রাঞ্জলের উত্তরের অপেক্ষা না করেই রিনা বলল, আজ থেকে দেড়শো-দুশো বছর আগে। অর্থাৎ তোমার দাদামশাইয়ের দাদামশাইয়েরও জন্মের আগে।
প্রাঞ্জল রিনার দিকে তাকাল। রিনা প্রাঞ্জলের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে বলল, আমাকে বলতে দাও প্রাঞ্জল। কত মায়া মমতার জল, বায়ু, রৌদ্র দিয়ে প্রকৃতি ওগুলোকে মহীরুহে পরিণত করেছে। আরও কতদিন ওঁরা একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে আনন্দে কাটিয়ে দিত। আর তোমরা চার হাজার ডলারের লালসায় গাছগুলোকে মাজা থেকে কেটে মেরে ফেললে।
নিশ্চুপ প্রাঞ্জলের দিকে ফিরে রিনা আবার উত্তর না পাওয়া প্রশ্নটা করল, তুমি আজও কবিতা লেখ প্রাঞ্জল? আগের মত আগুন ঝরা কবিতা? লেখনা, তাইতো? এক বার চেষ্টা করে দেখ, পারবে না। দুশো বছরের প্রাণকে দু টুকরো করে দেওয়া যতটা সহজ কবিতা লেখা ততটা সহজ নয় প্রাঞ্জল।
— তুই কী সব বলছিস!
এটা আমার কথা নয়, তোমার কথা প্রাঞ্জল। কৃষ্ণচূড়া কবিতাটা কাছে থাকলে আর একবার পড়ে নিতে পারতে।
রিনা কয়েক পা এগিয়ে গেল। গাছগুলোর মাঝে এলোমেলো ভাবে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর মনে হল এক একটা দ্বিখণ্ডিত বৃক্ষ জান সে নিজে, প্রাঞ্জল। কে জানে হয়তো বা অরূপও? শিকড় আঁকড়ে পড়ে আছে বাস্তবের মাটিতে। যা কিছু আলোড়ন সব আস্তরণের নিচে।

অরূপ রিনা ফিরে এসেছে সপ্তাহখানেক হল। ফিরেই অরূপ প্রাঞ্জলকে ফোন করেছিল পৌঁছানর সংবাদ দিতে। প্রাঞ্জলকে ধন্যবাদও দিয়েছে তার আতিথেয়তার জন্য। আজ রোববার, অলস সকালে অরূপ একগাদা খবরের কাগজে ডুবে। রিনা চা দিয়ে স্নান করতে গেল। তার মানে প্রায় আধঘন্টা অরূপ ঘরে একা। অরূপ সোফা থেকে উঠে আলমারির চাবিটা নিল। আলমারি খুলে দ্বিতীয় তাকে ডানদিকে ডাঁই করা জামা কাপড়ের তলায় হাত ঢোকাল। রিনা জানে না কিন্তু জায়গাটা ওর চেনা। সেখান থেকে নীল ডাইরিটা বের করে পাতা ওল্টাতে থাকল। সবকটা পাতাই অক্ষত কেবল সেই পাতাটাই দ্বিখন্ডিত। এখনও বাঁ দিকের মার্জিনটা ওপর উঁকি দিচ্ছে শিরোনামের প্রথম দুটো অক্ষর, কৃষ্ণ...। ■